Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 346 – 357
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্রনাথের 'ঋণশোধ' নাটকের অন্তর্নিহিত সত্য উদঘাটনে সংগীতের ব্যবহার

কেয়া রায়
গবেষিকা, সঙ্গীত ভবন
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
Email ID : keyaroy26@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Dramatist Rabindranath, Rinshodh, Music, Drama, Shardotsav, Poet, Truth.

Abstract
In Tagore's works, seasonal variation has been captured again and again in his unique style. If you look there, you can see that man, nature and God are the three main pillars. And when we think about this nature, it is natural to think about the seasons. Rabindranath composed his seasonal dramas with these seasonal variations. Among which the drama 'Rinshodh' (1922) is one. This play is a modified form of the play 'Shardotsav' (1908). The overarching theme of the play Rinshodh is the invocation of autumn. But deep down lies its innermost truth. Those theories are revealed through music. Nature fills the surroundings with its beautiful beauty during autumn and people enjoy it. But people do not return anything in return. Man should repay this nectar of nature's love with the love of his heart. Autumn invites the mind out of the house to unite with nature. Only then will the eternal relationship be unbroken through this give and take. Autumn is the perfect time to repay this debt, on the arrival of which the white shefali (Jasmine) bunches are adorned with white clouds and await the arrival of Saradalakshmi (God). Playwright Tagore was not only fascinated by the beauty of nature and wanted to express it through drama; He has made all the characters of the play leave the house with a noble purpose and has landed music in various contexts to show their accuracy. These songs are revealed in the voices of Balakdal (Boys), Thakurdada and Kabishekhar (Laureate). However, Kabishekhar has brought out the subtle themes of the play through music through his extraordinary poetic talent. Balakdal and Thakurdada basically spread the joy of autumn holidays in the hearts of the audience through songs. These songs are used in various scenes of the play which are very theatrically relevant. Apart from this, the presence of some other characters helped to convey the meaning of the play. The combination of all these characters helps to understand the essence of the drama. If they don't arrange the offerings of their life's sorrow, this debt repayment will remain incomplete somewhere. Dramatist Rabindranath took the help of songs to express this thought of mind. These songs are the medium of emotions and reveal the core truth of the theatrical theme.

Discussion

রবীন্দ্রনাথের রচনায় ঋতু বৈচিত্র্য বারে বারে ধরা পড়েছে তার বিচিত্র আঙ্গিকে। সেখানে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মানব, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই তিনটি হল এর মূল স্তম্ভ। তাঁর কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে —এই তিনটি বিষয়ে বারে বারে গুরুত্ব পেয়েছে এবং বর্ণিত হয়েছে কবির অনন্য প্রতিভায়। আর তাই প্রকৃতি নিয়ে ভাবতে গেলে ঋতুর প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক। মানুষের প্রবাহমান জীবনবৃত্তে নানা ঋতুর আসা যাওয়া কবির অগোচর হয়নি। তিনি প্রতিটি ঋতুর মাঝেই আপন অনুভূতিকে উজাড় করে তুলে ধরেছেন এবং চেষ্টা করেছেন জগতের সকল মানুষের অন্তরে প্রকৃতি প্রেমের আবেগ জাগিয়ে সকলকে একাত্ম করতে। তিনি সর্বদাই বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের যথার্থ প্রতিনিধি হল বিশ্বপ্রকৃতি। মানুষের জীবনে যেমন নানা রঙ মিশে আছে যা সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যুর নামান্তরে প্রকাশ পায় তেমনি প্রকৃতির মাঝেও সময়ে সময়ে নানা ঋতুর আগমন ঘটে যা মানব জীবনের চক্রাকার আবর্তনেরই অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন এই প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে চেয়েছিলেন তাই প্রকৃতির সাথে তাঁর অনুভূত সকল সংবেদনশক্তিকে লেখনীতে সংগৃহীত করেন। তিনি সর্বদাই নিজেকে মনে করেছেন 'আমি বিচিত্রের দূত'। তাই কোন নির্দিষ্ট সীমারেখায় তাঁর ভাবনাকে তিনি আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। তাঁর লেখনীতে এসেছে নিজস্ব শৈলী। নাটকের ক্ষেত্রে এসেছে অভিনবত্ব। কবিত্বের সাথে গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ মিশে গিয়ে নানা ঋতুর ভাবনা নিয়ে পরিবেশন করলেন এক বিশেষ ধরনের নাটক যা ঋতুবিষয়ক নাটক নামে আখ্যায়িত হয়। ১৯০৮ সালে আশ্রমের বালকদের জন্য তিনি প্রথম রচনা করলেন ঋতুবিষয়ক নাটক 'শারদোৎসব'। এই নাটকটি পরবর্তীতে পরিমার্জিত করে তিনি রচনা করলেন 'ঋণশোধ' (১৯২১) নাটক যার পরতে পরতে কবির মুন্সিয়ানা ধরা পড়ে আরও সুস্পষ্টভাবে। শারদোৎসব নাটকটির তেরো বছর পর ঋণশোধ নাটকটি রচিত হলেও এর মূল বিষয়বস্তু অভিন্ন। তবে চরিত্রের প্রকাশমতায় এসেছে কিছু সংযোজন। সর্বোপরি সংগীতের মধুরতা সেই চরিত্রগুলির ভাবনাকে ব্যক্ত করতে বিশেষ সহায়তা করে।

'ঋণশোধ' নাটকের মূল বিষয়টি হল শারদোৎসবের আবাহন। প্রত্যক্ষভাবে এর মূল বিষয়টি শরৎ কালের আগমনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হলেও এর অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম ভাবে রয়েছে এর অন্তর্নিহিত সত্যটি। তাই ঋতুবিষয়ক নাটক 'শারদোৎসব'এর অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে কবি বলেছেন—

> "এই সময় এখানে ঋতুউৎসবের প্রচলন হয়। মনে পড়ে, তখন থেকেই শারদোৎসবের সূচনা। আমার উদ্দেশ্য ছিল, এই সমস্ত অভিনয়, ঋতুউৎসবের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের একটি সহজ যোগ গড়ে উঠবে অগোচরে, অজান্তে — তাদের দৃষ্টি যাবে খুলে।"[1]

'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায় তাঁর শৈশবকাল থেকে অসীম প্রকৃতি প্রেমের কথা। তবে এই ঋতুবিষয়ক নাটক লেখার ক্ষেত্রে রয়েছে কবির এক অন্য অভিজ্ঞতা। কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে বসন্ত পঞ্চমীর দিন ঋতু উৎসবের ইচ্ছা প্রকাশ করলে 'আদি কুটিরে' তা অনুষ্ঠিত হয়। সালটি ছিল ১৮ই জানুয়ারি, ১৯০৭ (বাংলা ৪ ঠা মাঘ, ১৩১৩)। এরপর শমীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু ঘটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ধারা অব্যাহত রাখেন। তিনি আশ্রমের বালকদের উদ্দেশ্যে ১৯০৮ এ রচনা করলেন 'শারদোৎসব'। এর সাথে সাথে ঋতুবিষয়ক নাটক রচনার এক বিশেষ ধারা প্রবর্তন করলেন কবি। শারদোৎসবের তথাকথিত উচ্ছ্বাসকে ধরে রাখার পাশাপাশি পরবর্তীতে একে পরিমার্জিত করে 'ঋণশোধ' নাটকটি রচনা করলেন। এতে তিনি শুধু বালকদের জন্য নয়, সকলের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করলেন অনন্তকাল ধরে পৃথিবীতে নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে শরতের আসা যাওয়ার প্রকৃত সত্য। শরৎকাল ধরিত্রীর কোনায় কোনায় সঞ্চারিত হয়ে যখন ধানের শীষের উপর শুভ্র শিশির বিন্দু হয়ে প্রভাতে রৌদ্র কিরণে শোভিত হয় এবং চারিধার শুভ্র শ্বেতবর্ণে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে তখন তা আপনা আপনি মানুষের মনে আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়। অথচ মানুষ যেন প্রকৃতির মত আন্তরিক ভাবে এই প্রেমে সাড়া দেয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শরতের প্রতিটি স্পন্দনকে আপন নাড়ীর স্পন্দনে অনুভব করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন মানবহৃদয় তথা প্রকৃতি, পশু-পক্ষী, তরুলতা প্রভৃতি সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের অনন্ত

শক্তি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। তাই মানুষের উচিত তার হৃদয়ের সাথে সমগ্র বিশ্বকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে স্মরণ করা এবং নিজেকে তার মাঝে উন্মেলিত করা। তাই এসবের জন্য উপযুক্ত সময় হল সারদার আগমনকাল।

ঋণশোধ নাটকটির অন্তর্নিহিত সত্য উদঘাটন করতে গিয়ে নাটকের ভিতরের বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে যে চরিত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে তিনি হলেন কবিশেখর চরিত্র। এর আগে এই ধরনের চরিত্র বাংলা নাট্যধারায় বিশেষ লক্ষ্য করা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব নাটক থেকে ঋণশোধ নাটকের যাত্রায় কবির পরিণত বয়সে নির্মিত হয় কবিশেখর নামে এই বিশেষ চরিত্রটি। এই চরিত্রের সংলাপের দ্বারা নাট্য ভাবগভীরতা আরও সুদীর্ঘ হয়। আসলে নাটকটির উপরিভাগে শরৎ ঋতুর আবাহনের বার্তা দিয়ে বালক মনে আনন্দ সঞ্চার করা কবির উদ্দেশ্য হলেও এর অভ্যন্তরে রয়েছে প্রকৃতির সাথে আমাদের একাত্ম হওয়ার কথা। যাকে কেন্দ্র করে এই ঋতুবিষয়ক নাটকটি রচিত। দর্শকের মনোরঞ্জনের সাথে সাথে কোন এক বিশেষ দিককে আলোকপাত করা একজন নাট্যকারের সামাজিক কর্তব্য বটে। আর সেই বক্তব্য যদি দর্শকের বোধগম্য হয় এবং মনে রেখাপাত করে তবে সেটিই হল নাট্যকারের সার্থকতা। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় সর্বদাই মহানুভতির আধ্যাত্মিক কাঠিন্যকে সহজ সরল রূপে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করেছেন যা গানে কবিতায় ভাবের আতিশয্যে দর্শকের মনকে আন্দোলিত করেছে। সেই রূপ একটি গভীর সত্যকে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরতেই শারদোৎসব থেকে তিনি পরিমার্জিত করে ঋণশোধ নামকরণ করেন। এখানে কবিশেখরের মাধ্যমে কবির মূল লক্ষ্যই হল মানুষের মধ্যে কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করার ইচ্ছা। ফলে নাটকের আগাগোড়া নির্মিত হল শরৎকালের পটভূমিতে আর তাতে নিযুক্ত হল সংগীত। সেখানে প্রকৃতি ও পূজা পর্যায়ের গানগুলি মিলেমিশে একাকার হয়ে নাট্য চরিত্রের মুখে উপস্থাপিত হল। প্রকৃতি ভাবনার কাঠামোতে আধ্যাত্মিক চেতনার স্পর্শ পেয়ে রচিত হল ঋণশোধের এই গানগুলি। যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে শরতের প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করার কথা। আর সংলাপের কথায় কথায় তা বর্ণিত হল কবিশেখরের বক্তব্যে। রবীন্দ্রনাথ এখানে কবিশেখর চরিত্রটির দ্বারা বাস্তব জগতের মাঝে এক কল্পজগতের রূপায়ণ করেছেন যা নাটকে কোন সাধারন ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রকাশ করা দুরূহ। তাই কবিশেখর সমস্ত নাটকে যে ভাবে মানুষের প্রেমের ঋণ পরিশোধের প্রসঙ্গটি সংগীতের মাধ্যমে বারে বারে উল্লেখ করেছেন তা একজন কবির পক্ষেই প্রকাশ করা সম্ভব। কবিশেখর তাই আধ্যাত্মিক চেতনার সাথে কল্পনাকে মিশ্রিত করে অতি সহজেই গান বেধেছেন যা অবলীলায় সে গেয়ে বেরিয়েছে কখনো রাজসভায় কখনো মাঠে প্রান্তরে। তাছাড়া মানুষ জীবজগৎ প্রকৃতির সকল কিছুই তো পঞ্চতত্ত্ব সমূহের দ্বারা নির্মিত। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই একদিন মনুষ্য দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবে। সেই চক্রাকার নিয়মের মাঝে যেমন ঋতু বৈচিত্র্য আসে যায় তেমনি মানুষের জীবন নদীর মত বয়ে চলে উৎস থেকে বেরিয়ে নানা পথ অতিক্রান্ত করে নিজ গন্তব্যে। শেষে সেই আবর্তন পূর্ণ হলে মানুষ জীবনচক্র অতিবাহিত করে পরম আত্মায় বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতি যে ভাবে প্রতিটি ঋতুর আগমনে নিজের প্রেম দিয়ে তা উজাড় করে ভরিয়ে তোলে তাতে মানুষ সে ভাবে অংশগ্রহণ করে না। মানুষ তা অবহেলা করে নিজের নানা আসক্তির মধ্যে ডুবে থাকে। কিন্তু মানুষের উচিত প্রকৃতি বন্দনার দ্বারা সেই ঋণ পরিশোধ করা। তাই কবিশেখর সকলকে ঘর ছাড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। সংসারের তুচ্ছ চাওয়া পাওয়ার পরিসরে থেকে কখনই নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকৃতির কাছে অর্পণ করা সম্ভব নয়। তাই কবি সকলকে সংসারিক কর্ম থেকে কিছুদিন বিচ্যুত হয়ে নিজেকে আরও কর্মোদ্যমী করার প্রয়াস নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

এই কবিশেখর ছাড়া নাটকের বাকি চরিত্রের মধ্যে বিশেষ চরিত্র হল সম্রাট বিজয়াদিত্য। তিনি রাজতন্ত্র ছেড়ে কবির কথা মতো বেরিয়ে পড়েছেন ঋণ পরিশোধ করতে আর নিজেকে পুনর্বার যৌবনশালী ও মহিমান্বিত করে সিংহাসনে ফিরতে। রবীন্দ্রনাথের রাজা হল একজন প্রকৃত রাজা। সেই রাজার মধ্যে রয়েছে বৈষয়িক সম্পত্তির চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে ওঠার প্রচেষ্টা। তাই নাটকের বিজয়দিত্য বলেছেন —

"রাজ্যের লোভ মিটবে বলেই আমি রাজত্ব করি, বাড়বে বলে নয়।"[২]

বিজয়াদিত্য সত্যকার রাজা হয়ে ওঠার জন্যেই বেরিয়ে পড়েছে তার সাম্রাজ্যে। শারদোৎসব পালনের মধ্য দিয়েই তিনি তার পথ খুঁজে পেতে চান। এছাড়া ঠাকুরদাদা চরিত্রটিও একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ মানুষের দৈহিক যৌবনের চাইতে বরং মনের চিরযৌবন শক্তিকে উদ্দীপিত করার কথা বলেছেন বারে বারে বহু রচনায়। এই ঠাকুরদাদা হল সেই প্রকার একটি চরিত্রের প্রতিনিধি যিনি নিজেকে নতুন উদ্যমে জাগিয়ে বালকদের নিয়ে শারদ উৎসবের খেলায় মেতে উঠেছেন। এই শারদোৎসব সর্বতভাবে কি উপায়ে সার্থকতা পাবে সেই বিষয়ে যদিও তিনি অজ্ঞাত। তবে সংসারে একদিকে যেমন ভাবসাগরে ডুবে যাওয়া সর্বত্যাগী প্রকৃত বৈরাগ্যের সন্ধান মিলে তেমনি এর বিপরীতে প্রকৃতির বৈষয়িক প্রাচুর্যে সুখী মানুষের সংখ্যাও কিছু কম নয়। যারা লোভের বশবর্তী হয়ে জীবন থেকে কখনও পরিত্রাণ পান না। সব কিছু পেয়েও তারা অসুখী। তেমনি একটি চরিত্র হল লক্ষেশ্বর। এই ধরনের নানা চরিত্রের অবলম্বনে রচিত এই নাটকের সংগীত নানাভাবেই নাট্য তত্ত্বের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছেছে আর সেখানে সংগীত হয়েছে সেই ভাবের অগ্রদূত।

নাটকের কাহিনীতে সম্রাট বিজয়াদিত্য ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী রূপে বিশ্বের অমৃতের ঋণ পরিশোধ করতে প্রস্তুত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু তা কি উপায়ে সম্ভব তা তিনি জানেন না। তাই শেখরকে তিনি বলেন শেখর একজন কবি; কবিত্বের মহিমায় সে বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এরূপ ভাব প্রকাশের ক্ষমতা রাজার নেই। তার ক্ষমতা রাজশাসনেই সীমাবদ্ধ। আর তাতে শেখর জানায় আসলে "প্রেমও যে অমৃত, মহারাজ"[৩]। নিজের অন্তরের প্রেমটুকু উজাড় করে দিলেই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জানানো সম্ভব। প্রকৃতি শরতের সকালে সোনার আলোর শোভায় পাতায় পাতায় যে শিশির বিন্দু রচনা করে তা যেন বীণার তারের মতো ঝলমল করে ওঠে। সেটি যদি কেউ হৃদয়ে অনুভব করে আনন্দ লাভ করে তবে তাই হল যথার্থ ভালবাসা; তাই হল প্রকৃত ঋণ পরিশোধ। এরপর কবিশেখর অবলীলায় তার ভাব প্রকাশ করে সংগীতের মাধ্যমে যা কেবল কবিকে নয় সকলের হৃদয়ে এক বিশেষ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে —

"আজি শরত তপনের প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায় —
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কী যে গায়।
আজ মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়।"[৪]

গানের মাঝে সম্রাট বিজয়াদিত্য নানা বিষয়ে কৌতুহলী হয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। সে কবিশেখরকে জানায় — "কবি, ভালোবাসা তো দেব, কিন্তু কোথায় দেব?"[৫] শেখর সেই গানের রেশ ধরেই তার জবাব দেয় —

"আমি যদি রচি গান অথির পরান
সে গান শোনাব কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার!
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়?
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়!"[৬]

রাজার মন আজ বাজে খরচের জন্য গৃহছাড়া হতে প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু শেখরের সকল কথার মধ্যে যে মর্ম কথাটি লুকিয়ে আছে তা রাজার অজানা। তাই আবারও সে শেখরের কাছে শুনতে চায় মেঠো ফুলের গান। এতদিন

সিংহাসনে বসে সেই গান তাকে কেবল আমোদিত করেছে কিন্তু সেই গান সিংহাসনের গৌরবকে বিদীর্ণ করে রাজার হৃদয়ঙ্গম হয় নি। রাজার অনুরোধে শেখর তাই গানটি আবার গায় —

"যখন সারা নিশি ছিলেন শুয়ে
বিজন ভুঁয়ে
মেঠো ফুলের পাশাপাশি;
তখন শুনেছিলেম তারার বাঁশি।
যখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি
স্বপ্নে শোনা সে সুর এ কি
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি।
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে
শেষে ধরা দিল ধরার ধুলির 'পরে।
এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা
আকাশ থেকে ভেসে-আসা,
এ যে মাটির কোলে মানিক-খসা হাসিরাশি।"[৭]

এই গানের অর্থ অন্তরে অনুভব করতে গেলে রাজাকে মাটির কাছাকাছি আসতে হবে এবং সহজ ভাবে সকল অহংকার ত্যাগ করে সাধারণের সাথে আসন গ্রহণ করতে হবে। কারণ প্রকৃতি হল ঈশ্বরের প্রতিভু আর ঈশ্বরের কাছে ধরা দিতে হবে সর্বত্যাগী একজন সাধক রূপে। উপনিষদে যাকে বলেছে "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"[৮]। অর্থাৎ ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ। কবিশেখরকে রবীন্দ্রনাথ একজন প্রকৃত শিল্পীর মর্যাদায় নাটকে এনেছেন। তিনি কেবল রাজার রাজসভার কবি নন তিনি যেন রাজার অন্তরের পরম সত্তার প্রকাশক। তিনি গানের বাণী, গানের সুর ও সংলাপের দ্বারা সেই পরম সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছেন। তাই এই শরতের মাহাত্ম্য যদি একবার বিজয়াদিত্য বুঝতে পারেন তবেই তিনি হয়ে উঠবেন উপযুক্ত রাজা। যে রাজা কেবল সাম্রাজ্য লাভের জন্য রাজা নয় বরং যিনি হবেন একজন অহিংস, প্রজাহিতৈষী, মানবিক, আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রতীক। কবিশেখর নাটকের প্রথম পর্বে রাজাকে তার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত করেছেন।

দ্বিতীয় পর্বে রাজা ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়েছেন আর তার সহচর কবিশেখর বেরিয়েছেন পরদেশী রূপে। ওদিকে বালকদল শরতের ছুটির আনন্দে গেয়ে বেড়ায় —

"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে দিয়ে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি।
কেয়াপাতার নৌকো গড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব,
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল-ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু

চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।"[৯]

শরতে সকলের মন কাজ ভোলানো গান গেয়ে ঘরছাড়া হলেও লক্ষেশ্বর নামে এক বণিক একেবারেই এর বিপরীত। তার মনে এই গান সাড়া জাগালেও তার হিসাবের খাতায় পাছে ভুল হয়ে যায় তাই সে সদা তৎপর। কিন্তু বালকদল তো থেমে থাকার নয়। বালকদের মধ্য দিয়ে শরতের স্বতঃস্ফূর্ত রূপটি প্রকাশ করা হয়েছে। লক্ষেশ্বরের বারণ অমান্য করে তাই তারা ঠাকুরদাদার সাথে সকলে মিলে বনে, নদীর তীরে, মাঠে-ঘাটে ঘুরে শরতের আবাহনে গায় —

"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা।
ওরে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুট করে।
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।"[১০]

নাটকে গানের মুহূর্তে ঠাকুরদাদা চরিত্রের অবতরণে প্রথমেই দেখতে পাই একটি অতি পরিচিত গ্রামবাংলার সদাহাস্য সহজ সরল মুখ। তার ব্যক্তিগত পরিচয় সে ভাবে নাটকে উল্লেখিত না হলেও তার সকলকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা দর্শকের মনকেও আকর্ষণ করে। এই রসসিদ্ধ সদাপ্রসন্ন মূর্তি নিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন চিরযৌবনের প্রতিনিধি রূপে। বালকদের নিয়ে গানের মাঝেই যেন তার জীবনের সার্থকতা। নাটকে এই ঠাকুরদার বিশেষ কোনো পরিচয় না পাওয়া গেলেও তার আত্মভোলা সদাপ্রসন্ন ব্যক্তিত্বের সাথে বালকদলের উল্লাস অতি সুন্দর ভাবে গানের ভিতরে মিশে গেছে। নাটকের মাঝে শরতের আবাহনের মূল সুরটি তিনি ধরে রেখেছেন নিপুণভাবে। পরবর্তীতে যার তত্ত্ব ভার বিশ্লেষণের দায়িত্ব গিয়ে পড়ে কবিশেখরের স্কন্ধে। তাই এই ঠাকুরদাদার চরিত্রটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এই ঠাকুরদাদা এবং কবিশেখর চরিত্র দুটিকে যেন বিশেষ ইঙ্গিতবাহী করেছেন। এদের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্ররচনার গভীর তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠাকুরদাদা একটি সাধারণ চরিত্র হয়েও তার মধ্যে যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় তা এই নাটকের মূল সত্যটিতে আরও প্রাণ সঞ্চার করে। তাই ঠাকুরদাদার সাথে বালকদের গান দু'খানিতে সেই কাজ ভোলানো মন ভোলানোর কথা বলা হয়েছে। শরতের সাদা মেঘের ভেলা যেন ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলছে। আর এই দেখে শুধু মানুষ আর প্রকৃতি নয় সমস্ত জীবজগৎ মেতে উঠেছে। আজ যেন সকলের ঘরে না ফেরার দিন। তাই আজ সকলের 'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি/ কাটবে সকল বেলা'।

ঋতুকে কেন্দ্র করে নাটকে শরতের অনাবিল আনন্দকে সুন্দরভাবে পরিবেশন করার মধ্যে কোনো কঠিন তত্ত্ব নেই। কেবল নাচে গানে উল্লাসে ভরে ওঠাই শারদোৎসবের উপরিভাগের মূল বিষয়। তবে ঋণশোধ নাটকের কাহিনীতে মূল মোচড় আসে কবিশেখরের কণ্ঠে সংগীতের আবির্ভাবে। ফলে ঠাকুরদাদা ও বালকদল তাদের উদ্দেশ্যহীন উচ্ছ্বাসে একটি প্রকৃত ঠিকানা লাভ করে। আসলে কবিশেখর পথে বেরিয়েছে তার আপন দেশ খুঁজতে। সে দেশ কোনো লড়াই করে নয় বরং প্রেম দিয়ে লাভ করা যায়। শরতে অমৃতের প্রেম শুধতে কবিশেখর সেই দেশের সন্ধান করেছেন। অর্থাৎ এক মহৎ গন্তব্যে পৌঁছানোর কথা বলেছেন যাকে পাওয়ার মধ্য দিয়েই হবে কবিশেখরের প্রকৃত পাওয়া। তা পেলে কবিশেখর তার সকল প্রেম অর্পণ করে শরতের যথার্থতা লাভ করতে পারবে। পরদেশী শেখরের কথা ঠাকুরদাদার অন্যরকম মনে হলে শেখর তার গান দিয়ে তা সহজ করে বুঝিয়ে দেয় —

"কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না।
কেউ বোঝে না তারে,
সে যে বোঝে না আপনারে,
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না
তার খেয়া গেল পারে
সে যে রইল নদীর ধারে।
কাজ করে সব সারা (ওই) এগিয়ে গেল কারা
আনমনা মন সেদিকপানে দৃষ্টি হানে না।"[১১]

আসলে কবিশেখরের কথা সকলের মনকে টানে কিন্তু তার অর্থ বোঝা দায়। তার কথার জাদুময়তা মনে প্রশান্তি দিলেও এর অর্থ আসলে অসীম। রবীন্দ্রনাথের কাব্যময়তা ধরা পড়েছে এই কবিশেখর চরিত্রে। কবিশেখরের ব কলমে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ভাব চরিতার্থ হয়েছে এই নাটকে। তাই শেখরের মন অবলীলায় গেয়ে ওঠে গান। আসলে কবি মাত্রই এই পার্থিব জগতকে তারা সাধারণ মানুষের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। সেই দেখায় রয়েছে কল্পনা, বাস্তব ও পরাবাস্তবের এক অবিচ্ছিন্ন সংযোগ। কথার জাল বুনে সেই সেতুবন্ধন করাই কবির ধর্ম। আর কবিশেখর তো রবীন্দ্রনাথের মানস প্রতিনিধি। তাই সেই কবিত্বে সুরের স্পর্শ দিয়ে তাকে করে তুলেছে অতুলনীয়। ফলে এই নাট্য উপস্থাপন দর্শক মন স্বভাবতই মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করে। আর এইসবের আড়ালে নাট্যকার তাঁর অনন্য তত্ত্ব কথা পরিবেশন করে নানা গানে যা বিজয়াদিত্য, ঠাকুরদাদা প্রমুখদের মনকে জাগিয়ে তোলে এবং সাথে সাথে দর্শক হৃদয়কে।

এরপর নাটকে এল আরেকটি বিশেষ চরিত্র উপনন্দ। এই উপনন্দের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন শরৎ কাল কেবলই আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার সময় নয়। মানুষের গভীরে লুকিয়ে থাকা দুঃখটুকু উজার করে না দিতে পারলে যে ঋণ শোধের সবটুকু প্রেম ব্যর্থ হয়। তাই উপনন্দ ছেলেটি তার গুরুর ঋণশোধ করার উদ্যোগ নিয়েছে। সন্ন্যাসী বিজয়াদিত্য তার কথায় মুগ্ধ হয়ে বলে —

"...এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে। ...তুমি পঙক্তির পর পঙক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।"[১২]

অন্যদিকে শেখর ঠাকুরদাদা আর সন্ন্যাসীকে নিজের ভিতরের মানুষটিকে চেনার কথা স্মরণ করিয়েছেন। আসলে ভেতরের মানুষটিকেই তো সবাই বাইরে খোঁজে। অথচ সেই ভিতরের মানুষটি আমাদের সকল সুখ দুঃখের মাঝে বিরাজ করে। তাই শরতের প্রেমের ঋণ পরিশোধ করতে গেলে আত্ম অনুধ্যানের প্রয়োজন। নয়তো শরতের ছুটিতে যত্র তত্র ছুটে বেরিয়ে প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করা হলেও তাকে যথাযথ ভাবে ঋণ পরিশোধ করার কোন উপযুক্ত উপাদান পাওয়া যাবে না। এর মর্মার্থ বোঝাতেই আলোচ্য গানটি গেয়েছেন কবিশেখর —

"আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।

ও সে আছে বলে
আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে।
সে আছে বলে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়,
ও সে সঙ্গে থাকে বলে
আমার অঙ্গে অঙ্গে পুলক লাগায় দখিন সমীরণে।
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পুরে
আনমনা কোন তানের মাঝে আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে
আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চিরদিনের বলে
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে।"[১৩]

প্রতিনিয়ত যিনি জগৎ প্রকৃতিতে চলতে থাকা বিচিত্র রূপের খেলা, দিবারাত্রীর আবর্তন, নানা রঙে রসে ভরে ওঠা প্রতিটি ঋতুর আগমনের দ্বারা মানুষের মনে শরীরে শিহরণ জাগিয়ে তোলেন আবার সেই তিনিই আমাদের সকলের অন্তরেও বিরাজ করেন। অথচ তাকে সকলে খুঁজে বেড়ায় নিজের বাইরে। সে আমাদের ভিতরে অবস্থান করে নানা সুখ-দুঃখের দোলায় জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। আসলে উপনন্দের দ্বারা কবি বুঝিয়েছেন দুঃখ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একে সহজে গ্রহণ করতে হবে। আর যার কাছে এই সুখ দুঃখকে উৎসর্গ করতে হবে সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে চিনে নেওয়ার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ এই গানের মাধ্যমে। এখানে কবিশেখরের মাধ্যমে বাউলের 'মনের মানুষ' তত্ত্বটি এবং রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র ভাব রূপ যেন এক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "যিনি আমার সমস্ত ভালো-মন্দ আমার সমস্ত অনুকূল প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া লইয়াছেন তাহাকে কাব্যে আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি।"[১৪]

সুতরাং এই গানে সেই ভাবনা খুবই স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় কবিশেখরের বক্তব্যে। রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই মনে করতেন —

> "জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।"[১৫]

তাই বিশ্বদেবতার সাথে আত্মার মিলনের দ্বারাই ঋণ পরিশোধের কথা তিনি বলেছেন। রবীন্দ্ররচনাকালে তাঁর জীবনদেবতার সাথে অকপটে বাউল সাধনার প্রভাব মিশে যায় যারফলে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে কবিশেখরের কণ্ঠে বাউলাঙ্গের সুর বসিয়েছেন। উক্ত গানে কবিশেখর নানাভাবে সেই মনের মানুষেরই সন্ধান করেছেন অবিরত। রবীন্দ্রনাথের নানা নাটকে নানা কবিতায় সেই পাওয়া না পাওয়ার যে মর্ম বেদনা উদ্ভাসিত হয় তাই যেন ঋণশোধ নাটকে কবিশেখরের কণ্ঠেও উচ্চারিত।

সম্রাট বিজয়াদিত্য ছদ্মবেশ ধারণ করে তার রাজ্য পরিভ্রমণ করলে একজন প্রকৃত রাজার কর্তব্য সম্পর্কে তিনি অবগত হন এবং তার সাথে সাথে বিশ্বজগতের ঋণ পরিশোধের যথার্থ পরিভাষাটিও ক্রমে জানতে পারেন। সন্ন্যাসী বিজয়াদিত্যের সাথে বালক উপনন্দের একান্তে সাক্ষাৎ হলে তাদের কথোপকথনে সন্ন্যাসী জানতে পারেন উপনন্দ তার গুরুর ঋণ পরিশোধ করতে লক্ষেশ্বরের কাছে এসে ধরা দিয়েছে এই শরতের আনন্দের দিনে। উপনন্দ তার গুরু বীণাকার সুরসেনের প্রতি প্রকৃত ভক্তি প্রেমের কারণেই লক্ষেশ্বরের নানা কটুক্তি শুনেও যথাসাধ্য সেই ঋণের দায় থেকে গুরুকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে। এই কষ্টের ভিতরে রয়েছে ঋণ শোধের যথার্থ আনন্দ। সন্ন্যাসী তা উপলব্ধি করে তেমন ভাবেই হৃদয়ের প্রেম ঢেলে জীবনের হাসি কান্নার দোলা প্রেমের অর্ঘ্য রূপে ছড়িয়ে দিতে চান শারদার কোলে। এ সম্পর্কে আলপনা রায় মহাশয়া বলেছেন —

"নাটকের গভীরে যে ছুটির তত্ত্বের কথা আছে সে-আনন্দ তো এত সহজে অর্জনের নয়! ঋণশোধের কঠিন দুঃখ-তপস্যার মধ্যে সেই ছুটি, সেই আনন্দকে খুঁজে নিতে চেয়েছে উপনন্দ।"[১৬]

শরতের আনন্দময় প্রকাশের সঙ্গে উপনন্দের ঋণশোধের গভীর তত্ত্বকে মেলাতে পারে না ঠাকুরদাদা। সন্ন্যাসী বিজয়াদিত্য তাই শেখরকে সেই কথাটি আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে বলেন ঠাকুরদার উদ্দেশ্যে –

"দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া
তোমায় আমায়
জনম জনম এই চলেছে
মরণ কভু তারে থামায়?
যখন তোমার গানে আমি জাগি
আকাশে চাই তোমার লাগি,
আবার একতারাতে আমার গানে
মাটির পানে তোমায় নামায়।
ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা
তার ধারি ধার,
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে
শোধ করি তার।
আমার শরৎ-রাতের শেফালী বন
সৌরভেতে মাতে যখন,
তখন পাল্টা সে তান লাগে তব
শ্রাবণ-রাতের প্রেম-বরিষায়।"[১৭]

এই গানটিতে জগৎ প্রকৃতির সাথে মানুষের চির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দেওয়া-নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়ার কথাই কবিশেখর স্পষ্ট ভাবে বলেছেন। এই সম্পর্ক শুধু জীবনের এই পারে নয়; মরণের ওপারেও অবিরত এক অসীম সম্পর্কের বন্ধন। তাই যখন বিশ্ববীণার সুর জীবনবীণার একতারার ঝংকারে বেজে ওঠে তখনই তো মানুষ ও প্রকৃতির প্রেমের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। পঞ্চভূতের সমষ্টি হল এই জগত। সে অর্থে মানুষও পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত হয়ে একদিন এই পঞ্চভূতেই সমাহিত হবে। আর এর মাঝে রয়েছে যে জীবন তাতে প্রেম দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে মানুষ প্রকৃতির কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে এটিই হল চির আবর্তনের নিয়ম। প্রকৃতি উজাড় করে চারিদিক সাজিয়ে তোলে যা মানুষের জীবনকে সুন্দর ভাবে বিকশিত করে। প্রকৃতির সাথে মানুষের মেলবন্ধনের এই সত্য ঋণশোধ নাটকে আরও একবার কবি নিজস্ব আঙ্গিকে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। স্বভাবতই এই প্রকৃতি ও মানুষের প্রেমচেতনা তথা অবিচ্ছেদ্য ভাবনা কবিশেখর সুন্দর ভাবে কাব্যময়তা ও সুরের আবেশে নাটকে বয়ে নিয়ে চলে অবিরত ধারায়।

কবিশেখরের সাথে সন্ন্যাসীর সংলাপে উপনন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে জানা যায় প্রকৃত প্রেম হল দুঃখের শোভায় সুন্দর। শেখর বলে —

"ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। এই যে ধানের ক্ষেত আজ সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছু ও পেয়েছে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে।"[১৮]

শারদলক্ষ্মী আসলে বারে বারে এই প্রেম গ্রহণ করতে আসেন ধরিত্রীতে শারদোৎসব কালে। তাই মানুষের শুধু সুখটুকু নয়, মানুষের মনের দুঃখ কষ্টটুকু উজাড় করে না দিলে যেন প্রকৃত প্রেম কোথাও অব্যক্ত থেকে যায়। এ সম্পর্কে ড. অরুণকুমার বসু বলেছেন —

> "ঋতুর বাহ্যিক সৌন্দর্যকে কবি জীবনের একটি গভীর প্রতীতির সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। ...শরতের হিরণ্ময় রৌদ্রপ্লাবনে, শুভ্র শেফালির অযাচিত সৌরভে, শিশিরময় তৃণাসনে, ধবল জোৎস্নার বর্ণালিম্পনেই কবি নিবিষ্ট ছিলেন না — তার মাঝখানে কোনো লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল-পদ্মটিরও খোঁজ করেছেন কবি।"[১৯]

তাই মনের সকল ব্যথা পূজার অর্ঘ্য রূপে নিবেদন করলে তবেই তা দুঃখের রতন মালা হয়ে শারদার কণ্ঠে শোভামন্ডিত করবে। তবেই এই দেওয়া নেওয়ার প্রেম পরিপূর্ণ হবে। গানের মধ্য দিয়ে তাই আবারও তার বিশ্লেষণ —

"তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ
দুখের অশ্রুধার
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।
চন্দ্রসূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।
ধনধান্য তোমারি ধন
কি করবে তা কও,
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস,
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস,
এ মোর অহংকার।।"[২০]

শারদ সৌন্দর্যের আবাহন করার সাথে সাথে জীবনের দুঃখ কষ্টের রতন হার যদি তার পায়ে অর্পণ না করতে পারি তবে যেন শরতের প্রেম শোধবার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। উপনন্দ যে ভাবে নিজের প্রেমটুকু শরতের পদতলে দুঃখের অশ্রু ধারা দিয়ে সাজিয়ে নিবেদন করেছে — তাই যেন শারদলক্ষ্মী গ্রহণ করেছেন সানন্দে এবং পরিধান করেছেন নিজ কণ্ঠে। তাই সন্ন্যাসী অবশেষে কবিশেখরের সাথে সেই উপলব্ধির কথা ভাগ করে নিলে এই উক্ত গানটি যেন তার মর্মার্থ নিষ্পেষণ করে বুঝিয়ে দিয়ে সকলকে ধন্য করে তোলে।

কবিশেখরের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ত্যাগ ও প্রেমের সাধনা। আবার অন্যভাবে উপনন্দের মধ্যেও দেখিয়েছেন ত্যাগ ও প্রেমের সাধনা। কবিশেখর যদি কাহিনীর মূল সুরটি ধরে রাখতে সহায়তা করে তবে উপনন্দ চরিত্রটি হল 'ঋণশোধ' শিরোনামের উপযুক্ত উদাহরণ। উপনন্দ নিজের সুখ আনন্দ ত্যাগ করে গুরুর ঋণ মুক্ত করতে পুঁথি লিখে যে প্রকৃত প্রেমের সাধনা করেছে আসলে তা কোনো তুচ্ছ ব্যাপার নয়। অন্যদিকে কবিশেখর এবং সকলেই শরতের আনন্দের প্রেম শোধ করতে চাইছে কিন্তু দুঃখ ও ত্যাগ না থাকলে যে এই ঋণ পরিশোধ একেবারে বৃথা। কাহিনীর প্রারম্ভে সম্রাট কবিশেখরের কাছে জানতে চেয়েছিলেন কী উপায়ে এই শরতের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। তার উত্তর যেন নাটকের শেষে পাই উপনন্দ চরিত্রটির দ্বারা। তবে কথা সত্য যে কবিশেখর গানে গানে এই সকল বিষয়বস্তু বর্ণনা না করলেও হয়তো এর মূল বক্তব্য সকলের জানা হত ঠিকই তবে তা হৃদয়ে সে ভাবে সাড়া জাগাত

না। কবিশেখর কেবল রাজসভার কবি নন তিনি একজন প্রকৃত বৈরাগী। তাই তিনি সম্রাটের মনে রাজত্ব বাড়াবার লোভকে খর্ব করে প্রকৃত রাজা হওয়ার উপলব্ধি জাগিয়েছেন। একমাত্র প্রকৃত বৈরাগীই পারে সংসারের পরিসরে থেকে সংসারের সার কথা অনুভব করতে। তাই তো সে নিজে এবং সম্রাটকে ঘরছাড়া করেছে এবং বিশ্বদেবতার পায়ে সকলকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করতে প্রস্তুত করেছে। যিনি উদাসী যিনি মনের ভিতরে থাকা মানুষটির অন্বেষণকারী যিনি ক্ষ্যাপা যার কোনো কিছুতে আসক্তি নেই তিনি সর্বদা পরম বস্তুর সন্ধানে থাকেন। তিনি একমাত্র পারেন সকলের মনে প্রকৃত প্রেমের সঞ্চার করতে। আর তাই নাট্যকার মনে করেছেন কবিশেখরই একমাত্র সঠিক পথ নির্দেশ করতে পারেন। কবিশেখর একজন বৈরাগী বটে তাই তিনি অবলীলায় গান গেয়ে বেড়ান। নাটকের ঘটনা পরিশেষে সম্রাটের আসল পরিচয় সকলের সামনে এলে তার সাথে সাথে শরতের প্রকৃত অর্থ সকলের কাছে পরিষ্কার হয়। সবশেষে তাই গানে গানে কবিশেখর ও সকলে মিলে এই কাহিনীর সমাপ্তি ঘটায়-

"আমার নয়ন ভুলানো এলে!
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে!
আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ওইটুকু ওই মেঘাবরন
দু-হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে!
নয়ন-ভুলানো এলে!
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে —
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে
নয়ন-ভুলানো এলে!"[২১]

Reference :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী বিদ্যায়তন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৯
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৯৮৯
৩. তদেব, পৃ. ৯৯০
৪. তদেব, পৃ. ৯৯০

৫. তদেব, পৃ. ৯৯১
৬. তদেব, পৃ. ৯৯১
৭. তদেব, পৃ. ৯৯১
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীতচিন্তা, অন্তর-বাহির, বিশ্বভারতী, কলকাতা, জৈষ্ঠ্য ১৪১১, পৃ. ৩০
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৯৯৩
১০. তদেব, পৃ. ৯৯৬
১১. তদেব, পৃ. ৯৯৮
১২. তদেব, পৃ. ৯৯৯
১৩. তদেব, পৃ. ১০০০
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড, আত্মপরিচয়, বিশ্বভারতী, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২৬, পৃ. ১৩৯
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মানুষের ধর্ম, বিশ্বভারতী, কলকাতা, আষাঢ় ১৪১৮, পৃ. ৯৮
১৬. রায়, আলপনা, গানের নাটক নাটকের গান, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৫৮
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ১০০৮
১৮. তদেব, পৃ. ১০০৯
১৯. বসু, অরুণকুমার, বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১৭, পৃ. ৪২৮
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ১০০৯
২১. তদেব, পৃ. ১০১৭